ভূমিকা

উপভাষা বলতে মূলত কথ্যভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা বা একটি বিশেষ অঞ্চলভুক্ত লোকজনের মুখের ভাষাকে বোঝায়। এই ভাষা হতে হবে কতগুলি অর্থবহ ধ্বনিসমষ্টির বিধিবদ্ধ রূপ যার দ্বারা ঐ অঞ্চলভুক্ত জনসমষ্টি নিজেদের মধ্যে ভাব বিনিময় করতে পারেন। ভাষাবিজ্ঞানী ব্লুম ফিল্ড এর মতে — 'A Group of people who use the same system of spech singnals is a speech community.' অর্থাৎ বিজ্ঞানীরা যাকে বলেছেন 'একটি ভাষা সম্প্রদায়' (speech community) ; কিন্তু ভাষা সম্প্রদায়ের ব্যবহৃত ভাষার রূপ সর্বত্র একরকম নয়, আর একই ভাষার মধ্যে এই আঞ্চলিক পার্থক্য থেকেই উপভাষার সৃষ্টি। সুতরাং এটা পরিস্কার যে একই ভাষার একাধিক উপভাষা থাকতে পারে কিন্তু একটি উপভাষার ভাষা ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে না। উপভাষার থেকে ভাষার ভৌগোলিক পরিমণ্ডল বিস্তৃত হলেও ভাষা থেকে উপভাষা বিছিন্ন কিংবা পৃথক নয়। এই প্রসঙ্গে ভাষার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে — ' Specific form of a given language, spoken in a certain locality or geographic area, showing sufficient differences from the standard or literary form of that language, as to pronunciation, grammatical construction and idiomatic usage of words, to be considered a distinct entity, yet not sufficiently distinct from other dialects of the language to be regarded as a different language.' [Pei. Merio A. and Gaynor, Frank. 'A dictionary of Linguisties' - 1970, Londan, p. 56] অর্থাৎ ভাষা ও উপভাষার মধ্যে যে পার্থক্য আছে তা শ্রেণিগত নয়, মাত্রাগত। এই পার্থক্যের মান বেশি হলে সেটি উপভাষা না হয়ে আলাদা ভাষার মর্যাদা লাভ করে। অবশ্য এই মাত্রা নির্ণয়ের কোনো সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড এখনও স্থির হয় নি।

আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় 'বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা' গ্রন্থে বলেছেন — 'বাঙ্গালা ভাষার গ্রাম্য শব্দ সংকলন করা, বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি তথা বঙ্গ-ভাষা-ভাষী জাতির পত্তনের ইতিহাস আলোচনার জন্য একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কার্য্য।' — তাঁর এই মহামূল্যবান কথাটি মাথায় রেখে আমার পূর্বপুরুষের জন্মভূমি অধুনা বাংলাদেশের বরিশাল জেলার আগৈলঝাড়া উপজেলার কথ্যভাষা ও তার ভাষাতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ বিষয়ে গবেষণা করতে উদ্যোগী হই। বহুবার ক্ষেত্রসমীক্ষায় গিয়ে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের মানুষদের কাছ থেকে যে সমস্ত ভাষাবিষয়ক শব্দ ও উপাদান সংগ্রহ করেছি; তারই ভাষাতাত্ত্বিক পর্যালোচনা আমার সীমাবদ্ধ বুদ্ধিমত্তায় অকুণ্ঠ ভাবে প্রতিস্থাপন করার চেষ্টা করেছি গবেষণা অভিসন্দর্ভটিতে।

পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে উপভাষা বিষয়ে বেশ কিছু গবেষণার কাজ হয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ড. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদের 'A study of standard Bengali and the Noakhali Dialect' (1985). ড. পৃথ্বীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'বীরভূমের উপভাষা', ড. অনিমেষ কান্তি পালের 'পূর্ববঙ্গের একটি উপভাষা ঃ ঢাকাই', ড. অসীম কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নদিয়া জেলার উপভাষা', ড. অদিতি রায়ের 'কাঁথি মহকুমার উপভাষা', ড. শ্যামাপ্রসাদ দত্তের 'পাঁচ পরগণিয়া উপভাষা', ড. নির্মলেন্দু ভৌমিকের 'প্রান্ত উত্তরবঙ্গের উপভাষা'। এছাড়াও অনেকে উপভাষা নিয়ে কাজ করেছেন। তবে আমাদের জানা মতে বরিশাল জেলার ভাষা নিয়ে তেমন উল্লেখযোগ্য কোন কাজ অদ্যাবধি হয় নি। আমাদের গবেষণা সেই শূণ্যতা পূরণ করবে বলে আশা করছি।

এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন আমাদের গবেষণার শিরোনাম — 'বরিশালের আগৈলঝাড়া উপজেলার কথ্যভাষা ঃ ভাষাতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ।' - হলেও এই গবেষণায় সমগ্র বরিশাল জেলার উপভাষাগত বৈশিষ্ট্যই ধরা পড়বে। ভাষা যেহেতু কোনো সীমাবদ্ধ গণ্ডীর দ্বারা আবদ্ধ করা যায় না। ক্ষেত্রসমীক্ষায় গিয়ে সমগ্র বরিশাল জেলা ঘুরে ঘুরে সেটাই মনে হয়েছে। কেবলমাত্র দক্ষিণ বরিশালে কিছু কিছু শব্দের উচ্চারণে ভিন্নতা লক্ষ করা গেছে। এই উপভাষা নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে উপভাষার উচ্চারণগত, শব্দ ব্যবহারগত, অর্থগত এত বৈচিত্র্য ও স্বাতন্ত্র্য ধরা পড়েছে; যা মাঝে মাঝেই আমাদেরকে বিব্রত হতে হয়েছে কিন্তু পাশাপাশি কাজে অধিকতর উৎসাহিত হয়েছি। ভৌগোলিক দিক থেকে উপজেলাটির উত্তরে ফরিদপুর, পশ্চিমে কোটালীপাড়া, পূর্বে গৌরনদী, দক্ষিণে উজিরপুর।

বরিশালের আগৈলঝাড়া উপজেলার কথ্যভাষা বিষয়ে গবেষণা করতে গিয়ে প্রথমে সমগ্র বরিশাল জেলার ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যগত বিষয়ে জানার চেষ্টা করি। উপজেলাটির প্রতিটি গ্রামে ঘুরে ঘুরে নানা ধরনের তথ্য সহ ব্যবহৃত শব্দসমূহ সংগ্রহ করতে থাকি। অলক্ষে টেপ রেকর্ডার -এর সাহায্য নেই। উল্লেখ্য আমার বেশভূষা শব্দ তথা তথ্য গ্রহণে বাঁধা হয়ে দাঁড়াত তাই ওখানকার লুঙ্গি পড়ে ঐ ধরনের মানুষের বেশ-ভুষা পরিধান করে এলাকায় ঘুরে ঘুরে সর্ব শ্রেণীর মানুষের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছি।

ক্ষেত্রসমীক্ষায় ভাষা সংহের জন্য যে পদ্ধতিগুলি গ্রহণ করেছি তা হলো —

১) এলাকার প্রধান যাতায়াতের মাধ্যম ভ্যান। তাই ভ্যানে যেতে যেতে টেপ রেকর্ডার চালিয়ে কোন বিষয়ে ভ্যানওয়ালার সঙ্গে কথা বলতে থাকতাম। যত সময় প্রয়োজন হত ভ্যানওয়ালাকে একস্থান থেকে অন্য কোথাও যেতে বলতাম যাতে আমার উদ্দেশ্য বুঝতে না পারে।

২) রাত্রি বেলা গ্রামের কোনো বাড়ি ঝগড়া লাগলে লুকিয়ে গিয়ে রেকর্ড করতাম।

৩) প্রথম প্রথম আমি কলকাতার লোক বলে লোকে নিজের ভাষা একটু ভালো উচ্চারণ করে আমার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করত - সেটা বুঝতে পেরে ওখানকার কিছু প্রবাদ মুখস্থ করে ওখানকার লুঙ্গি ও জামা

পরিধান করে সাধারণ ভাবে অন্য গ্রাম থেকে তথ্য মূলক কিছু অফিসিয়াল কাজ কর্ম করতে এসেছি বলে শব্দ সহ নানা তথ্য সংগ্রহ করেছি।

৪) গ্রাম্য বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানে ভিরের মধ্যে কেউ না বুঝতে পারে এমনভাবে একের সঙ্গে অন্যের কথোপকথন লিখতাম এবং রেকর্ডিং করতাম — পরবর্তীতে যখন লেখা ও শোনা কথা এক হত সেটাই সঠিক বলে গ্রহণ করেছি।

আমাদের গবেষণা কর্মের সমগ্র কাজটিকে মোট ৬টি অধ্যায়ে বিভাজন করেছি, প্রথম অধ্যায়ে ক্ষেত্রটির ভৌগোলিক ও আঞ্চলিক পরিচয়সহ বিভিন্ন গ্রামের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দান করেছি। এ ছাড়া ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যগত কিছু কিছু তথ্যের অবতারণা করেছি। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ধ্বনিতাত্ত্বিক আলোচনা করা হয়েছে। এখানে স্বর ধ্বনির অবস্থান, স্বর ধ্বনির প্রকৃতি ও পরিবর্তন, দ্বি-স্বরধ্বনি; ব্যঞ্জন ধ্বনির অবস্থান ও ব্যবহার এবং তাদের উচ্চারণ ও পরিবর্তন দেখানো হয়েছে। এছাড়াও রয়েছে ধ্বনি পরিবর্তনের বিভিন্ন ধারা।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত সংবাদ প্রভাকরে এই অঞ্চলের কথ্যভাষার বিশেষত্ব ধরা পড়েছে। যেমন — 'ঢাকা ও বিক্রমপুরের ভাষার সহিত এখানকার ভাষার কোন কোন অংশের বিলক্ষণ ঐক্য আছে, এবং উচ্চারণের শেষ একটা রেশ প্রায় তুল্যরূপ, "ক" স্থানে "অ" এবং "অ" স্থানে "হ" উচ্চারণ প্রায় করিয়া থাকে, "ধ" স্থানে "দ" "ভ" স্থানে "ব" ইত্যাদি। ... ঘ, ধ, ভ এই তিনবর্ণের উচ্চারণ এককালেই করিতে পারে না। বেটা স্থানে বেডা, ফাটা স্থানে ফাডা, পাঁটা স্থানে পাডা, ঘড়ি স্থানে গরি, যাব স্থানে যামু, হরি স্থানে অরি, হস্তি স্থানে অস্তি, করেছ স্থানে করচ্, বসিব স্থানে বস্মু, বসিবেন স্থানে ববেন, হাট স্থানে আট, আসুন স্থানে আস্কুন। আবাদ বৃদ্ধ বনিতা প্রভৃতি তাবতেই "আজ্ঞা, আপনি মশয়" এই সম্বোধনীর সাধু শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন।' (সংবাদ প্রভাকর, সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, ২৮ শে চৈত্র ১২৬১)

আমাদের গবেষণায় এই বিশেষ দিকটি সমান ভাবে ধরা পড়েছে। এর বিস্তৃত বিবরণ ধ্বনিতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া যথাস্থানে আলোচনা করা হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য 'চ'-বর্গীয় ধ্বনিগুলির উচ্চারণে বেশ অভিনবত্ব রয়েছে। 'চ' -এর উচ্চারণ ইংরেজি ch বা tch -এর মতো না হয়ে অনেকটা ইংরেজি ts এর মতো হয়। স্বাভাবিকভাবে জ -এর উচ্চারণ ইংরেজি j -এর মতো না হয়ে dz বা z এর মতো মনে হয়। তাই আমরা এই উপভাষায় 'চ'-বর্গীয় ধ্বনিগুলিকে যথাক্রমে চ, ছ, জ, ঝ রূপে চিহ্নিত করেছি। এছাড়া উষ্মবর্ণের উচ্চারণের ক্ষেত্রে বিশেষ স্বকীয়তা লক্ষ করা যায়। শব্দের আদিতে, মধ্যে ও অন্ত্যে 'স' ও 'শ', 'হ' -এ পরিণত হয় যেমন - শাক > হাগ, বসা > বহা, বসেন > বহেন, 'ছ' ধ্বনি কখনো 'স' এর মতো উচ্চারিত হয় যেমন - আসিছ > আহিস (এই ক্ষেত্রে স চিহ্ন প্রয়োগ করেছি) তবে শব্দের আদিতে 'চ' ধ্বনিটি মান্য চলিতের

মতোই অবিকৃত থাকে তবু ধ্বনিটি যেহেতু ঐ বর্গীয় তাই চ চিহ্ন সর্বত্রই দেওয়া হয়েছে। এর উল্টোটাও হতে দেখা যায় এই উপভাষায় যেমন - ছিপ > সিপ (অর্থাৎ ছ ~ স = ছ/স চিহ্নিত করেছি), আবার 'স' -এর উচ্চারণ 'চ' এর মতো হয় যেমন - স্কুল > ইচ্কুল, স্ক্রু > ইচ্কুরু (তাই স ~ চ = চ করা হয়েছে।) ট-বর্গীয় ধ্বনির (ট, ঠ) ক্ষেত্রে শব্দের আদিতে অবিকৃত থাকে কিন্তু শব্দের মধ্যে ও অন্ত্যে প্রায় সর্বত্র ড -এ রূপান্তরিত হয়। যেমন — কাঁঠাল > কাডাল, পাট > পাড। 'ড়', এবং চন্দ্রবিন্দু এই উপভাষায় স্বাভাবিক ভাবে আসে না। যেমন - ঘড়ি > ঘরি, গাড়ী > গারি, চাঁদ > চান, বাঁশ > বাশ।

তৃতীয় অধ্যায়ে রূপতত্ত্ব বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। এখানে রূপিমের সাহায্যে শব্দগঠন প্রক্রিয়া, ক্রিয়ার কাল, যৌগিক ক্রিয়া, সংযোগমূলক ক্রিয়া, অন্ত্যর্থক ক্রিয়া (থাক্ + মু = থাক্মু), ন-র্থক ক্রিয়া, প্রযোজক ক্রিয়া, নাম ধাতু (হুগা + ইছে = হুগাইছে), শ্রেণি বিভাগ সহ বিভিন্ন কারক ও তাতে ব্যবহৃত কারক চিহ্ন, উপসর্গ, অনুসর্গ, সর্বনাম প্রভৃতির রূপতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা আলোচ্য উপভাষার বাক্যে প্রয়োগ সহ বোঝানোর চেষ্টা করেছি।

চতুর্থ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় বাক্যতত্ত্ব বা বাক্যরীতি (Syntax) । এখানে বাক্যের পদ সংস্থান, সর্বনাম পদের ব্যবহার রীতি (মুই, মোর, মোগো, তুমি, হে, আম্নার, ওয়াগো প্রভৃতি), উক্তি, বাচ্য ইত্যাদি বিষয়গুলিকে ঐতিহ্যগত ব্যাকরণের সূত্র মেনে আলোচনা করা হয়েছে।

পঞ্চম তথা শব্দ ভাণ্ডার অধ্যায়ে তৎসম, তদ্ভব, দেশি, বিদেশি, অজ্ঞাতমূল, এবং মিশ্র শব্দের তালিকা প্রদান করে শব্দ ব্যবহারের (শ্রেণিগত) প্রবণতা দেখানোর চেষ্টা করেছি।

পরবর্তী অধ্যায়ে শব্দার্থ পরিবর্তনের বিভিন্ন কারণ, সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ, বিশিষ্টার্থক শব্দ, শব্দার্থ পরিবর্তনের বিভিন্ন ধারা বিষয়ে পর্যায়ক্রমিক আলোচনা করেছি।

পরিশেষে প্রবাদ-প্রবচন, ধাঁধা ও বিভিন্ন বিষয়ক লোক গানের অবতারণা করা হয়েছে। এছাড়া ক্ষেত্রসমীক্ষায় যাঁদের অকৃত্রিম ভালোবাসা ও অকুণ্ঠ সহযোগিতা পেয়েছি এবং যাঁদের নিকট থেকে মৌখিক ভাষাগত উপাদান ও বিভিন্ন তথ্য-সংগ্রহ করেছি তাঁদের নামের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদান করেছি।